সাইতামা

শান্তির শহর হিরোশিমা

এক সুন্দর সকালে ঘটে গেল প্রলয়ঙ্করী ঘটনা। পৃথিবীর সবচেয়ে বর্বরতম ও নিষ্ঠুর কাজটি করলো আমেরিকানরা। আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মুহূর্তে মেরে ফেললো দেড়লাখ মানুষ

লিখেছেন জাপান থেকে **জাকির হোসেন**

৩১ ডিসেম্বর আমাদের যাত্রা শুরু। গাড়ি চলছে। আমরা রাস্তার এপাশ ওপাশ তাকিয়ে শহরের নানারকম দৃশ্য দেখছি। ক্যাসেট প্লেয়ারে গান বাজছে, কেউ কেউ ব্যক্তিগত রেকর্ড বাজাচ্ছে। এভাবে ভালোই চলছে আমাদের যাত্রা। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চলছে। কিন্তু শর্ত হল ৮০ কি.মি. গতির নিচে গাড়ি চলতে পারবে না। ৮০ কিলো-মিটারের কম গতিতে গাড়ি চালালে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা নেই। ফাইন অবধারিত। তাই গাড়ি ১৩০-১৪০ কি.মি. গতিতে চলছে। ডিসপ্লেতে ভেসে উঠছে রাতে কোন জায়গার তাপমাত্রা কত, কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে, কোথায় বরফ পড়ছে, কোথায় দুর্ঘটনা ঘটেছে ইত্যাদি আমরা আগে থেকেই তথ্য জানতে পারছি। যাই হোক, একটানা ৬ ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে আমরা একটা পার্কিং-এ গাড়ি থামিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। আবার যাত্রা শুরু। আমাদের ইচ্ছে রাত ১২টায় নতুন বছরকে স্বাগত জানাবো। চেয়ে আছি টিভি সেটের দিকে কখন ১২টা বাজবে। এক সময় অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো, ১২টা বাজলো। খুব ধুমধামে একুশ'শ শতাব্দীকে স্বাগত জানাচ্ছে। আমরাও টিভি দেখেই নববর্ষকে স্বাগত জানালাম। আবার যাত্রা শুরু। এবার বিরতিহীনভাবে গাড়ি চালিয়ে এক সময় পৌঁছে গেলাম হিরোশিমা। ১ জানুয়ারি সারা জাপানে নতুন বছরের ছুটি উপলক্ষে দোকানপাটগুলো বন্ধ থাকে। কোথাও কোথাও বাস, ট্যাক্সি পর্যন্ত বন্ধ থাকে। তাই আমরা সকালের নাস্তা সেরে আমাদের গাড়ি নিয়েই ঘুরতে বের হলাম।

হিরোশিমায় এই বোমা ডোম

বোমা ডোমের পাশেই বিখ্যাত ওতাগাওয়া নদী

হিরোশিমা ঘুরতে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য আণবিক বোমার ধ্বংশলীলার স্থান দেখা, আর তা দেখতে হলে প্রথমেই যেতে হবে 'হিরোশিমা শান্তি স্মৃতি পার্কে'। সেখানে গিয়ে প্রথমেই দেখতে পেলাম 'বোমা ডোম'। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকাল ৮.১৫ মিনিটে আণবিক বোমার বিস্ফোরণে পুরো হিরোশিমা শহর হঠাৎ এক চোখ ধাঁধানো আলোতে ডুবে যায়। কিন্তু একটি মাত্র বিল্ডিং (বোমা ডোম নামে পরিচিত) দাঁড়িয়েছিল যুদ্ধাহত অবস্থায় এবং এখনো দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধের স্মৃতি স্বরূপ। যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল অনেক, তবে প্রাণহানির সংখ্যা ছিল এক লাখ চল্লিশ হাজারেরও বেশি। পারমাণবিক বোমার আঘাতে পুরো হিরোশিমা শহর নিমিষে তামায় পরিণত হয়েছিল। আর এখন সেই হিরোশিমা শহর আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর 'শান্তি শহর' হিসেবে। যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শান্তি স্মৃতি পার্কে বহু 'স্তম্ভ' আছে, তার মধ্যে ছাত্রদের তৈরি স্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য। দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী যুদ্ধে প্রাণ হারায়, তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রাইমারি, জুনিয়র স্কুল, হাই স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের টাকায় উল্লিখিত স্তম্ভটি তৈরি করে। এছাড়া রয়েছে 'শান্তি শিখা' ধনুকাকৃতি স্মৃতি স্তম্ভের পাশেই শান্তি স্মৃতি মিউজিয়াম।

পরের দিন ২ জানুয়ারি। হিরোশিমা শহর থেকে বেশ দূরে মিয়াজিমা দ্বীপ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা ফেরি পার হয়ে বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে দেখছি। এরিমধ্যে কয়েক জায়গায় হরিণ দেখতে পেলাম এবং হরিণের সঙ্গে সখ্যতা করে ছবি তুলে নিলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পরই দেখতে পেলাম মিয়াজিমা অ্যাকুরিয়াম, জাপানের কয়েকটি বড় অ্যাকুরিয়ামের মধ্যে মিয়াজিমা অ্যাকুরিয়াম একটি। অ্যাকুরিয়ামে বিভিন্ন প্রজাতির ১২,০০০ মাছ রয়েছে। তিমি, ডলফিন, জেলি ফিস, হাঙ্গর ও চিংড়ি মাছসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা ৪৫০ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী ও মাছ দেখতে পেলাম।

মিয়িজিমা দ্বীপের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে রোপওয়েতে চড়া এবং রোপওয়ে থেকে নেমে পাহাড়ের ওপর থেকে দূরবিনের সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগরের নীলকে উপভোগ করা। তাই আমরা ২০ মিনিট হেঁটে রোপওয়ের মমিজিদানি স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে রোপওয়েতে চড়লাম। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ভেতর থেকে ডানে-বামে দেখছি। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, নিচে তাকিয়ে খুব ভয় হচ্ছিল। কেননা নিচ থেকে আমরা কয়েকশ' মিটার ওপর দিয়ে যাচ্ছি।

মিয়াজিমা দ্বীপের আকর্ষণ রোপওয়ে

আশপাশে কোনো বাড়ি-ঘর নেই, শুধু বন আর বন। রোপওয়েতে চড়ে চমৎকার অনুভূতি, কোনো প্রকার ঝাঁকি লাগে না, জ্যাম জটের আশংকা নেই একেবারে।

৩ জানুয়ারি আমাদের নিজ গন্তব্যস্থলে আসার জন্য সকাল ৯টায় রওনা দিলাম। রাস্তায় কয়েক জায়গায় পার্কিং-এ গাড়ি থামিয়ে হালকা খাবার খেয়ে নিলাম। এবং ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮০ কিলোমিটার জ্যামে পড়েছি। তবে একসঙ্গে বড় জ্যামে পড়েছি ৪০ কিলোমিটারের। জ্যামে পড়ার কারণে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে বেশ দেরি হয়েছে। অবশেষে রাত ১২টায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছি।

নিউইয়র্ক

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

নিউইয়র্ক থেকে **আকবর হায়দার কিরণ**

বাংলাদেশে এখন চলছে আমলা-তান্ত্রিক রাজত্ব এবং সন্ত্রাস ও মাস্তানি। কথাগুলো বলেছেন দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ৩০ বছরও পালিত হয়। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন প্রবাসীদের বাংলাদেশের 'ক্রিম' বলে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন বিদেশে যত সচ্ছলই থাকুন না কেন দেশের মাটি, মানুষ ও মানচিত্র ভালো না থাকলে গর্ব করার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট থাববে না। এর আগে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্ক পৌঁছলে সাজু হোসেন ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে জেএফকে বিমানবন্দরে আন্তরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সাপ্তাহিক বাংলাদেশ আয়োজিত এই জমজমাট অনুষ্ঠানে প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি সভাপতি ডা: এম. হামিদুজ্জামান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ওয়াজেদ খান, ডা: ওয়াদুদ ভূঁইয়া, ডা: দেলোয়ার হোসেন, ডা: মইনুল ইসলাম মিয়া, মাহমুদ চৌধুরী, আনিসুজ্জমান খোকন, এটর্নি শেখ সেলিম, দেওয়ান শামসুল আরেফিন, আনোয়ারুল ইসলাম বাচ্চু, ইসমাইল খান আনসারী ও ইত্তেফাকের নিউইয়র্ক সংবাদদাতা মাহমুদ খান তাসের। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সেবার জন্যে ক'জনকে পদকে ভূষিত করা হয়। যাদের মধ্যে রয়েছেন নাজমুল হুদা, মতিউর রহমান জনি, এম. আজিজ, নাফিউল ইসলাম পান্না, দেওয়ান শামসুল আরেফিন, মৃণাল হক, মাহমুদ খান তাসের ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) এবং বাংলাদেশ কালচারাল একাডেমী (বিসিএ)। পাশাপাশি ১৮ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকেও পদক দেয়া হয়।

ইয়াকোহামা

মন ও নৈতিকতা

নৈতিকতা ব্যাপারটি দেশ কাল ভেদে একই রকম। সততা প্রমাণের জন্য স্থান বদল কোনো বিষয় নয় সর্বত্রই একই রকম

অনেক দিনের চেষ্টার পর ঠিক করা গেলো পরবর্তী ছুটির দিনে দেখতে যাবো 'সি প্যারাডাইস'। যার প্রধান আকর্ষণ ফিশ অ্যাকুরিয়াম। ইয়াকোহামা স্টেশন থেকে সাধারণ ট্রেনে কিছুটা যাওয়ার পর লাইন পরিবর্তন করে অতঃপর চড়তে হবে ড্রাইভারবিহীন ট্রেনে। ড্রাইভারবিহীন ট্রেনে চড়তে পারার উপরি আনন্দের পাওনাটুকু যোগ হলো একই সঙ্গে মনটায়। জানি না, কেন ছোট্টবেলার ঈদ প্রতীক্ষার নিশ্চুপ ভালো লাগায় কেটে গেলো বাকি ক'টা দিন। সকাল সাড়ে ৮টায় ছয় বন্ধু মিলে রওনা দিলাম বাসা থেকে স্টেশনের উদ্দেশে। হঠাৎ খেয়াল করলাম যতোই স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছি সবারই কথাবার্তায় কেমন একটা নীরবতা নেমে আসছে এবং গতিও কমে আসছে হাঁটায়। কারণটা বুঝতে আমার হাঁটার গতি কমানোর পরেও দেখতে পাই আমিই সবার আগে। নিজের কাছে খুব খারাপ লাগলো প্রকৃত কারণটা যখন অনুভব করলাম। অর্থবিত্তের অবস্থান পরিবর্তন করলেও মনের অবস্থান যে কখনো কখনো নিম্নমুখী হয় জানলাম প্রথম।

সবাই ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাই নিজের জন্য একটিমাত্র টিকেট কাটা অশোভন। সবার জন্য কেউ একজন টিকেট না কাটতেও প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাছে অপ্রকাশিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সবাই সবার জন্য খরচ করবো এটাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিকতাটা ঠিক রাখতে সবার আগে গিয়ে ১ মান ইয়েন-এর (প্রায় ১০০ ইউএস ডলার) নোট মেশিনে ঢুকিয়ে ৬টি টিকেট নিয়ে সবাইকে বিতরণের পর খেয়াল হলো মেশিন থেকে বেরুনো ফেরত টাকা নেয়া হয়নি। ফিরে যেতেই দেখতে পেলাম একজন জাপানি উক্ত মেশিন থেকেই

সি প্যারাডাইসের আকর্ষণ ফিশ অ্যাকুরিয়াম

টিকেট নিয়ে চলে যাচ্ছে, আশপাশে কোথাও আমার টাকাটা নেই। কাউকে জিজ্ঞেস করার সুযোগটাও পেলাম না, কারণ সাথের বন্ধুরা সবাই অনেকদূরে এগিয়ে গেছে আমাকে রেখেই। ধারণা করলাম, ফেরত টাকাটা ওই জাপানিই পেয়ে নিয়ে চলে গেছে তাই দেরি না করে দৌড়ে এগিয়ে গেলাম বন্ধুদের সঙ্গে একত্রিত হবার জন্যে। ছোট্ট হলেও আনন্দের পথ যাত্রার শুরুতেই আমার কষ্টের কথাটুকু প্রকাশ করলাম না কারো কাছেই।

'সি প্যারাডাইস'-এ সারাদিন একত্রিত হয়ে হৈ-হুল্লোড়ে সবকিছু ঘুরে ফিরে দেখার পর সন্ধ্যায় ফেরার পথে ঘটনাটা বললাম সবাইকে। শুনে সবাই হতবাক এবং নানান প্রশ্ন। ঘটনার সেখানেই আমি সমাপ্তি টানতে চাইলেও এক বন্ধু বললো, মেশিনেও অনেক সময় সমস্যা হবার কারণে টাকা ফেরত আসে না এবং তাই যদি হয় তাহলে টাকা মার যাবার প্রশ্ন নেই। আর বেরিয়ে থাকলে কেউ তো অবশ্যই নিয়ে গেছে। স্টেশন মাস্টারের কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। উক্ত স্টেশনে নেমেই বন্ধুটি স্টেশন মাস্টারের কাছে (অবশ্যই তখন অন্যজন ছিল) সময়সহ ঘটনাটা খুলে বলতেই তিনি অপেক্ষার কথা বলে ভেতরে চলে গেলেন এবং একটু পরেই রাবার ব্যান্ড দিয়ে প্যাঁচানো ছোট্ট একটি পলিথিন প্যাকেট যার ভেতর ছিলো আমার পাওনা ফেরত টাকা। বন্ধুর হাতে দিয়ে রসিকতা করে বললেন, 'টাকা তোমাদের বেশি হয়ে গেছে ঠিক না'।

Leton
1612-1, Ikebe-Cho
Tsuzuki-ku, Yokohama. Japan

সিডনি

তাসমানিয়ান টাইগারের পুনরুত্থান

পৃথিবীব্যাপী বিজ্ঞানের জয়জয়কার চলছে। ১৯৩৬ সালে হোবার্ট চিড়িয়াখানায় তাসমানিয়ান টাইগার মারা যায়। ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রাণীটিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে

'অস্ট্রেলিয়ান মিউজিয়াম'-এর বিজ্ঞানীরা এক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চলেছেন। ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে তারা বিলুপ্ত প্রজাতির Tasmanian Tigerকে আবার নতুন করে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। তাসমানিয়ান টাইগারের এখন আর কোনো অস্তিত্ব নেই। সর্বশেষ জীবিত এ প্রাণীটি মারা গেছে ১৯৩৬ সালে তাসমানিয়ার হোবার্ট চিড়িয়াখানায়। অথচ হাজার হাজার বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ার মূলভূমিতে এরা অবাধে বিচরণ করত। মূলভূমি ছেড়ে তাসমানিয়ায় এরা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল চার হাজার বছর আগে, যখন আদিবাসীদের মাধ্যমে এশিয়া থেকে ডিংগোর আগমন ঘটল। ইউরোপীয়দের আগমনের পর সমানে তাসমানিয়ান টাইগার মারা পড়তে লাগল। কারণ সবার ধারণা হলো, ভেড়া ও গৃহপালিত পশুপাখির মারাত্মক শত্রু এরা। সরকারও তাসমানিয়ান টাইগার নিধনে সে সময় সর্বাত্মক সমর্থন দেয়। ফলে মাংসভোজী এ প্রাণীটি খুব দ্রুতই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের Advanced cell Technologies-এর বিজ্ঞানীরা বন্য ষাঁড় গাওর-এর ক্লোন তৈরি করেন। এ জন্যে তারা গৃহপালিত গাভীর ডিম্বাণুতে গাওর-এর DNA প্রতিস্থাপিত করেন। গাওর-এর যে ক্লোন বাচ্চা জন্ম নেয় তার নাম ছিল নোয়াহ্। জন্মের পর পরই সে মারা যায়। তবে এটা ছিল এক ব্যতিক্রমী এবং যুগান্তকারী অগ্রগতি যাতে এক প্রজাতি অন্য প্রজাতির সাহায্যে ক্লোন করা হয়। তাসমানিয়ান টাইগারের ক্ষেত্রে আরো ব্যতিক্রম এ প্রজাতির কোনো সদস্য আর জীবিত নেই। বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি এখন ১৮৬৬ সালে এলকোহলে ডুবানো এক তাসমানিয়ান টাইগারের মৃত বাচ্চার দিকে। তারা এই বাচ্চার মৃত কোষ থেকে DNA নমুনা নিয়ে তাসমানিয়ান টাইগারের পূর্ণ জেনেটিক কোড বের করবেন। বিলুপ্ত প্রাণীকে ক্লোনিং-এর মাধ্যমে পুর্নঃ আবির্ভাবের এটাই প্রথম প্রচেষ্টা। ভাড়াটে পিতামাতা হিসেবে থলেধারী প্রাণী নামবেট বা কুউলকে ব্যবহারের চিন্তা করছেন বিজ্ঞানীরা। যদিও তাসমানিয়ান টাইগার থেকে এরা আকারে ছোট। তবে এটা তেমন কোনো ব্যাপার নয়— ভাড়াটে মাতা নামবেট বা কুউল মাত্র চার সপ্তাহের জন্যে এ ভ্রূণকে বহন করবে।

বাঘ বা সিংহের মতো তাসমানিয়ান টাইগারও ছিল মাংসাশী প্রাণী। তবে এটার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এরও ছিল ক্যাঙ্গারুর মতো পেটে থলি। এ থলিতে তাসমানিয়ান টাইগার তার বাচ্চাকে বহন করত। মাংসভোজী থলেধারী প্রাণীর মধ্যে তাসমানিয়ান টাইগার ছিল সবচেয়ে বৃহৎ। এদের খাবার ছিল ক্যাঙ্গারু, ইঁদুর ও পাখি।

Australian Museum-এর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যয় হবে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। আর গবেষণার সময় ব্যয় হবে প্রায় কুড়ি বছর। তারপর হয়তো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে। যদি এ গবেষণা সফল হয় তাহলে আর কখনো

ক্লোন পদ্ধতির মাধ্যমে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা তাসমানিয়ান টাইগার

কোনো প্রজাতি এ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে না। অস্ট্রেলিয়ান মিউজিয়ামের ডিরেক্টর প্রফেসর মাইক আরচারের আশা— পুনঃ আবির্ভূত তাসমানিয়ান টাইগার পোষা যাবে আর সব পোষা প্রাণীর মতই। দেখা যাক বিজ্ঞানীরা তাদের প্রচেষ্টায় সফল হন কি না। মানুষ অনেক অসাধ্যকে সাধন করেছে, তাই আমরাও তাদের সফলতা কামনা করি। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠক/পাঠিকাদের প্রতি শুভেচ্ছা রইল। কেউ এ লেখাটি পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব।

Dr. Wahiduzzaman Khan (Ripon)
10/9 Fairmount st. Lakemba , Sydney, NSW 2195, Australia

টোকিও

হুইলচেয়ার কুকুর ও শিক্ষার্থী

চিকাকো তাতাবায়াসি, ২১ বছরের এই ছাত্রী তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের প্রথম দিন থেকে ক্লাসে, ক্যাম্পাসে তার সঙ্গে দুটো জিনিস নেবার অনুমতি পেয়েছে। এক হচ্ছে তার চিরন্তন সঙ্গী হুইলচেয়ার যা ১৯৯৮ সালে তার ট্রাফিক দুর্ঘটনার পরপরই শরীরের নিম্নাংশ অবশ হয়ে গেলে নিত্যসঙ্গী হয়, অপরটি হচ্ছে তার প্রিয় সঙ্গী তার 'গাইড'— তার কুকুর 'এটম'। বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত এই কুকুরটি সার্বক্ষণিকভাবে তাতাবায়াসির সঙ্গে থাকে। এটি তার হুইলচেয়ার টেনে নেয়, লিফটের সুইচ অফ- অন করে— বই খাতা এগিয়ে দেয়, কাউকে বিরক্ত না করে গোটা ক্লাসে চুপচাপ শিক্ষকের লেকচার শোনে। তাতাবয়াসি তার ক্যাম্পাস জীবনের আশাই ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু কুকুর 'এটম' তার স্বপ্ন পূরণ করেছে। ছবিতে তাতাবায়াসি তার দশিশা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনের প্রিয় সঙ্গী হুউলচেয়ার ও কুকুর 'এটম'সহ সদাহাস্য।

ইয়াজদার হক ইনান, টোকিও, জাপান, 3-5-9-105 Hanahata, Adachi-Ku, Tokyo 121-004

মিউনিখ

শহীদ দিবসে শিলার

বাঙালি পাঠকরা দোকানে ঢুকে পত্রিকা পড়ে 'ফাও' চা খেয়ে চলে যায়। এজন্যে পিনআপের ব্যবস্থা করা হচ্ছে

আজ বুধবার, জার্মানে কোনো ছুটির দিন নয়, কাজেই কাজ করতে হবে। প্রতিদিনের মত থলেতে ভরে নিলাম দিনলিপির পুঁথি আর শিলারের একখানা প্রবন্ধের বই। ট্রেনে পড়তে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ৪৫ মি. পর ট্রেন থেকে নেমে, পাতাল রেলের দিকে দৌড় দিলাম। কাজের জায়গায় পৌঁছে দেখি কম্পিউটার রুমে একটি কম্পিউটারও আমার জন্য অপেক্ষা করেনি। সবাই যার যার ব্যবহারকারীদের নিয়ে ব্যস্ত। পড়া হল না ইন্টারনেটে প্রথম আলো।

কাজে লেগে গেলাম। ক্যান্সার কোষের জিন বিভাজনে। দেখতে দেখতে পৌনে পাঁচটা বেজে গেল। এলিজাবেথকে ফোন করে তার স্বামীর ভ্রাম্যমাণ দূরালাপনী নম্বর পেলাম বটে, কিন্তু তার স্বামীকে পেলাম না। তার স্বামীর কাছে শুনেছিলাম যে, মিউনিখে একটা বাঙালি দোকান আছে। সে দোকানে ভুরিভোজন থেকে শুরু করে বই পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় সব কিছুই নাকি পাওয়া যায়। আমি মিউনিখ থেকে প্রায় ৭০ কি. মি. দূরে ছোট্ট একটা মফস্বল শহরে থাকি। কাজের পরে বাঙালি দোকানে 'আড্ডা' মারার শক্তি থাকে না। তাই চিনিও না, যাইও না। মিউনিখে থাকে অন্য একজন বাঙালি। তার নম্বরটা প্রথমেই চেষ্টা করিনি কারণ তাকে এ সময়ে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনো উপায় না দেখে তাকেই ধরতে চেষ্টা করলাম। প্রথমবারেই তাকে পেয়ে গেলাম। বাঙালি দোকানের ঠিকানা জানতে চাইলে, আগামী দিন নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাইরে একটা জরুরি কাজের অজুহাত দিয়ে তড়িঘড়ি বিদায় নিতে চাইলো। বললাম আজ শহীদ দিবস। আমি আজই সেখানে যেতে চাই। ঠিকানাটা নিয়ে দোকানে গেলাম। সাধারণ বাঙালির মত বাংলার বদলে জার্মানে অভিবাদন জানালেন ভদ্রলোক। দোকানটা ছিমছাম। প্রথমেই পত্রিকার খোঁজে চোখ বুলালাম। অনায়াসে পেয়েও গেলাম। খুঁজতে লাগলাম বুভুক্ষুর মত চেনা সব পত্রিকার চলতি সংখ্যা। সন্তুষ্ট হতে হল সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১২ জানুয়ারি সংখ্যা, সাপ্তাহিক আরো একটা পত্রিকার ৬ ফেব্রুয়ারির সংখ্যা পেয়েই। সবগুলো পত্রিকাই পিনআপ করা। কারণ বাঙালি পাঠকরা দোকানে ঢুকে পত্রিকা পড়ে 'ফাও' চা খেয়ে চলে যায়। কেউ কেনে না। যদিও একটি কপির দাম মাত্র ২ মার্ক ৫০ পেনি। এই পয়সায় জার্মানে এক কাপ কফিও পাওয়া যায় না।

K. Bhuiyan, Stellen str : 30, Germany

সেলেংগর

এদের বাঁচান

আমরা যারা প্রবাসী তাদের প্রতি অনুরোধ, কোনো একটি ঘটনার জন্য সবাইকে ঢালাওভাবে দোষারোপ করবেন না

বছর তিনেক আগে কুয়ালালামপুরে আমরা ৮ জন বাঙালি একটি ফ্ল্যাটে থাকতাম। আমাদের সাথে কবির নামে একজন থাকতেন। তিনি ছিলেন খুবই আল্লাহওয়ালা মানুষ, আমরা তাকে শ্রদ্ধা করতাম। তিনি মেয়েলি বিষয়ে খুবই সচেতন। যখন চীনা মেয়েরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতো বা নিচে নামতো, তখন তিনি আমাদের উপদেশ দিতেন, তোমরা ঐ বেপরোয়া মেয়েদের দিকে নজর দেবে না। দেখো এটা আমাদের দেশ নয়। তোমরা যদি উগ্র হও, তখন দেখবে এমন এক সময় আসবে পালাবার রাস্তাও পাবে না। অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে তোমাদের জীবন। প্রায়ই রাতে এশার নামাজের জামাত হতো। অন্যান্য বাসা থেকেও আরো কিছু বাংলাদেশী আমাদের ফ্ল্যাটে আসতো। আমাদের কবির ভাই ইমামতি করতেন। নামাজ শেষে আমাদের ইমাম কবির ভাই প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন। বলতেন 'আমরা কতো অবহেলিত, আমাদের মাতৃভূমি থেকেও আজ নেই। আমাদের মা-বাবা-ভাই-বোন, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে কতো অসহায় জীবন যাপন করছি। আমরা স্বাধীন হয়েও পরাধীন, রাস্তায় পুলিশের ভয়, স্থানীয় বখাটে ছেলেদের উৎপাত। দেখো এখানে আমাদের একটিই স্বপ্ন, আমরা আমাদের পরিশ্রমের টাকা জমা করে একদিন দেশে যাবো, একটি সুন্দর নীড় গড়বো'।

একদিন হঠাৎ রাত ১২.৩০ মিনিট ফোন আসে। জাকির ভাই ফোন ধরেই আমাকে ডেকে পাঠালেন। সাথে ১০০০ রিংগিট নিয়ে হোটেল তাইপে চলে এসো। হোটেলে পৌঁছেই দেখি কবির ভাইকে পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে রেখেছে। ১০০০ রিংগিট দিয়ে ছাড়িয়ে আনা হলো। কারণ, কবির ভাই ৬০০ রিংগিট দিয়ে এক পতিতার সাথে হোটেলে রাত যাপন করছিল। ঐ রাতে পুলিশ হোটেল তাইপেতে Operation চালিয়েছিলো বলে কবির ভাইকে আমি রাত ১২.৩০ মিনিটের সময় সাহায্য করতে পেরেছিলাম। কবির ভাইয়ের ওই ঘটনা আমি আর বলিনি। ওই ঘটনার পর তার আত্মশ্লাঘা দেখে অবাক হয়েছিলাম। আমি এতই দুঃখ পেয়েছিলাম যে, মনে মনে প্রভুকে বলেছি– প্রভু তুমি কেনো কবির ভাইকে এ পাপ কাজ করতে দিলে? আমি আজও তাকে শ্রদ্ধা করি। কারণ, তিনি সত্যি সত্যি তার ভুল বুঝতে পেরে পরিবর্তন হয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুর থেকে মোহাম্মদ মামুন প্রায়ই এ বিভাগে কিছু না কিছু লিখে থাকেন। ভালোই তো লিখছিলেন, কিন্তু গত ১২ জানুয়ারি ২০০১, বর্ষ ৩, ৩৫ সংখ্যায় 'এদের বাঁচান' শিরোনামে তিনি লিখেছেন, সিঙ্গাপুরে সমস্ত বাংলাদেশীরা যৌনাচারে লিপ্ত। তারা ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে। তাই তিনি বাংলাদেশে তাদের বাবা-মাদের অনুরোধ করেছেন সন্তানদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে তাদের রক্ষা করার জন্য। বাবা-মাদের আরো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, 'নিশ্চয়ই জানেন কার সন্তান কেমন'। অপমান, লজ্জা যাক সেদিকে আর যাবো না...। মামুন সাহেব ছোট্ট একটি প্রশ্ন, আপনি কি নিজেকে ঠিক রাখতে পেরেছেন? যদি পেরে থাকেন তাহলে কবির ভাইয়ের দিকে লক্ষ্য করুন। Please নিজে ধার্মিক হয়ে দয়া করে অন্যকে তিরস্কার করবেন না। আপনি জানেন? আপনার লেখাটিতে কতো প্রবাসীর ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ন হয়েছে?

Suharab Khan, C/o : Litro Industry S/B, 19 Persiara Selat Selatan, Sobina Jaya Industryal Estate, Pandamaran, 42000 Port Klang, Selangor. Malaysia

প্রবাসীদের প্রতি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপনমনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটি আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন প্রবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবিআমার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.